THE IMPRESSION, A Journal on Multi-Disciplinary Studies
Annual Issue 2018 (ISSN: 2278-2699)

রবীন্দ্রনাটকে গানের প্রাসঙ্গিকতা

অর্পিতা বোস*

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাধনার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় রবীন্দ্র শিল্পপ্রতিভার উষালগ্ন থেকে জীবনের শেষ পর্যায়অব্দি এই নাট্যসাধনার পথ বিধৃত হয়েছে। একদিকে নাটকের ক্রমোন্নতির পথ ধরে এসেছে কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, গদ্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য। মোটামুটি ভাবে বিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। সঙ্কেতধর্মী নাটক সৃষ্টি হয়। নাটকের তত্ত্বচিন্তা বা মূল বক্তব্যকে গানের সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যে কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, বা যে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না রবীন্দ্রনাথ তাকেই তাঁর গানে তুলে ধরেছেন। 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"...ভাষার মতো হৃদয়ের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নেই, তাহাকে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়... তাহাকে বুঝিতে অর্থ করিতে অনেকটা সময় যায়। কিন্তু সংগীত একেবারে এক ইঙ্গিতেই হৃদয়কে আলিঙ্গন করিয়া ধরে।"

ঋতুনাট্যের যুগে প্রকৃতির বিচিত্র লীলার রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছে মানবলীলা। সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বহীন এই চির-অবিচ্ছেদ্য, চিরকালের সত্য-সম্বন্ধের এক অপর লীলা। 'রক্তকরবী' নাটকটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকের প্রাণপ্রতিমা নন্দিনী নামের নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নাটকের মূল কাহিনি। যক্ষপুরীর শ্রমিকের দল মাটির তলা থেকে সুরঙ্গ বেয়ে খোদাই করে তুলে নিয়ে আসে সোনার পিণ্ড। কিন্তু তাদের কোনো মনুষ্য-পরিচয় নেই। কিশোর, ফাগুলাল, সর্দার, মোড়ল, গোঁসাই, চিকিৎসক, বিশু ,চন্দ্রা সকলের ভবিষ্যৎ যক্ষপুরীর যন্ত্র-শাসনের চাপে বিকৃত হয়েছে। নন্দিনীই 'রক্তকরবী' 'পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ'। 'রক্তকরবী' নাটকের অধিকাংশ গান গীত হয়েছে বিশুর গলায়। নন্দিনীর কণ্ঠে মাত্র একটা গান পাই। নন্দিনীই বিশু পাগলের গানে সুর দিয়েছে, নাচে ছন্দ দিয়েছে। বিশুর গানগুলোয় তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত।

নন্দিনীর প্রতি তার গভীর প্রেম পরিণত লাভ করেনি। নন্দিনী তার স্বপনতরীর নৌকা। নাটকে বিশুর প্রবেশ হয়েছে—

"আমার ভাবনা তো সব মিছে,

আমার সব পড়ে থাক পিছে

তোমার ঘুমটা খুলে দাও,

তোমার নয়ন তুলে চাও,

দাও হাসিতে মোর পরাণ ছেয়ে।"

*অধ্যাপিকা, শ্রী চৈতন্য মহাবিদ্যালয়, হাবড়া

প্রকৃতির দেওয়া সহজ-সরল অনাবিল আনন্দের জীবন রস থেকে যক্ষপুরীর মানুষগুলো বঞ্চিত। সুরঙ্গের অন্ধকারে তাদের অন্তরাত্মা হারিয়ে যায়। বিশু তাদের জন্য গান বাঁধে—

"তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,
তবে মন রসে নে পেয়ালা ভরে
সে যে চিতার আগুন গলিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্টহেসে দেয় রঙিন করে।"

নন্দিনী নিজের পূর্ণতা দিয়ে যক্ষপুরীর জড়ত্বের মধ্যে এনেছে প্রাণের চেতনা। রাজা-ফাগুলাল-অধ্যাপক সবার উত্তরণ হয় নন্দিনীর হাত ধরেই। প্রেম, দয়া, করুণা, ভালোবাসা, অনাবিল আনন্দ সবকিছু দিয়ে যক্ষপুরীর পীড়িত মানুষগুলোকে সে উপনীত করেছে প্রাণের লীলাক্ষেত্রে। রঞ্জনের আগমনের খবরে নন্দিনী বিচলিত হয়ে ওঠে, বিশুর কাছে সে শুনতে চায় 'পথ চাওয়ার গান'।

রক্তকরবী নাটকে প্রকৃতির বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন প্রাণহীন যক্ষপুরীর সমাজকে, সেখানে পাকা ফসল ভরা ক্ষেতের বিপরীতে যক্ষপুরীর রাজার লোহার জাল, সুরঙ্গের মৃত্যু সমান অন্ধকার। নাটকে বারবার ফিরে এসেছে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটি। এখানে আছে অসীম আর অনন্তের আহ্বান। রক্তকরবী নাটকের প্রকৃতির বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন প্রাণহীন যক্ষপুরীর সমাজকে, পাকা ফসলভরা ক্ষেতের বিপরীতে অবস্থান করে যক্ষপুরীর রাজার লোহার জাল। যক্ষপুরীতেও 'মাঠের লীলা' শেষ হয়, শুরু হয় প্রাণের লীলা।

এবার আসা যাক 'মুক্তধারা' নাটকের কথায়। রূপক-সাংকেতিক নাটক বলেই এই নাটকের সংগীতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'মুক্তধারা' নাটকের দৃশ্য উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, ভৈরবমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীগণ স্তবগান করে পরিভ্রমণরত। উত্তরকূটের রাজার রণজিতের সভায় যন্ত্ররাজ বিভূতি বহু বছরের চেষ্টায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলে মুক্তধারা ঝর্ণাকে বেঁধেছেন। তার এই অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত করার উপলক্ষে উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব মন্দিরের প্রাঙ্গনে উৎসব করতে চলেছে। এমনই এক পরিবেশে সন্ন্যাসীদলের কণ্ঠে স্তোত্রবন্দনা উচ্চারণ করিয়ে এমন এক আবহমণ্ডল রচনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে মুক্তধরার মূল বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মতো মুক্তধারাতেও বৈরাগী চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তার নাম ধনঞ্জয়। কণ্ঠে তার উদাত্ত সংগীত। অভিজিৎ প্রেমের আবেগে কাজের ক্ষেত্রে যখন সেই আদর্শ অনুসরণে ব্যস্ত তখনই আঘাত নেমে এসেছে তার উপরে আবার ঠিক সেই সময় ধনঞ্জয়ের প্রবেশ, মুখে তার গান— "আমি মারের সাগর পাড়ি দেবো বিষম ঝড়ের বায়ে/ আমার ভয়ভাঙা এই নায়ে ।।"

ধনঞ্জয় বৈরাগীর পরম আদর্শের, মুক্ত আত্মার প্রতীক। তাকে বাঁধনে বেঁধে ফেলা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। তার কথায়— "আমারে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন, সে কি অমনি হবে?"

ধনঞ্জয় বৈরাগী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন "পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়।" পথ তিনি দেখিয়ে দিলেও তার জন্য মানুষের কর্তব্য আছে; যে নিজের পথের দায়িত্ব গ্রহণ করে না, আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে না। তাই "আমি তার মনে ছাড়া তরী এই শুধু মোর দায়।" ধনঞ্জয় বৈরাগী পরম আদর্শের মুক্ত আত্মার প্রতীক। তাকে বেঁধে ফেলা কারোর পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। সে নির্ভয়ে গেয়ে বেড়ায়— "আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কোন খ্যাপা সে"। অভিজিৎ চিরচঞ্চল, চিরগতিশীল মানবাত্মা, জলের প্রবাহে তার জন্ম। তাই তাকে যন্ত্রজগতের বাঁধনে বেঁধে ফেললেও তারে নিত্য মুক্ত শুদ্ধ আত্মাকে তো আর

বাঁধা যায় না। কারণ সে দুঃখ বরণের মূল্যে পরম সত্যের উপলব্ধিতেও জ্যোতিষ্মান— "তোমার শিকল আমায় বিকল করবে না। তোর মারে মরম মরবে না।।"

রবীন্দ্রনাটকে গানগুলো যেভাবেই নাটকে এসে আশ্রয়লাভ করুক না কেন, এসব নাটকে পাত্র-পাত্রীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই গানগুলো গেয়েছে নিজমনে। 'শারদোৎসব'-এর বেশিরভাগ গানই স্বেচ্ছাপ্রাণোদিত— "আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা', 'তোমায় সোনার থালায় সাজাব আজ', 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' ইত্যাদি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে কৃষকগণ যেন আপন মনে গেয়ে ওঠে "হ্যাদে গো নন্দরানী আমাদের শ্যামাকে ছেড়ে দাও"। 'শারদোৎসব' নাটকের ছেলেরা সন্ন্যাসীর অনুরোধে সমবেত কণ্ঠে গান ধরেছে—

"আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ,

আমরা বেঁধেছি শেফালি মালা"

এবার আসা যাক 'রাজা' নাটকের গান প্রসঙ্গে। 'রাজা' নাটকের মূল কাহিনি বৌদ্ধ অবদান সাহিত্যে কুশজাত থেকে নেওয়া হয়েছে। 'রাজা' নাটকের প্রথম গান—

"খোলো রে খোলো রে দ্বার রাখিও না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।"

গানটির প্রথমেই দ্বার খোলার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এই আবেদন রাজাই করেছেন। রাজা নাটকের দ্বিতীয় গান সুরঙ্গমার গাওয়া। গানটি প্রথম লাইন, "এ যে মোর আবরণ।" এই গানটি সুরঙ্গমার চরিত্রকে প্রকাশ করেছে। 'রাজা' নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বালকগণকে নিয়ে ঠাকুর্দার প্রবেশ। প্রবেশের পরে ঠাকুর্দা কিছু কথার পরেই একটি গান ধরেন। সেই গানেরই লাইন—

"আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো!

গানটিতে ঠাকুর্দা বসন্তকে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। যার মধ্য দিয়ে বসন্ত আসবে ঠাকুরর্দা তারও বিবরণ দিলেন। যার বর্ণনা পাই ঠাকুর্দার সংলাপে—

"ওরে দক্ষিণে হাওয়া সঙ্গে যখন পাল্লা দিতে হবে, হার মানলে চলবে না—আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।"

'রাজা' নাটকে রানী সুদর্শনা ও আরো কিছু জনতা রাজাকে চোখে দেখতে চেয়েছে। এবং এই নিয়েই বারে বারে তারা রাজাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। এই গানের রাজাকে প্রাণের মানুষ বলা হয়েছে। গানটি এইরকম—

"আছে সে নয়ন-তারায় আলোক ধারায়, তাই না হারায়,

ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়

তাকাই আমি যেদিক পানে।।"

হৃদয় তথাহৃদয় তথা অনুভব দিয়েই রাজা উপস্থিত অনুভব করতে হয়।

এবার আসা যাক নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'-র আলোচনায়। এর প্রকাশকাল ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ। বৌদ্ধ সাহিত্যের কাহিনি থেকে'চণ্ডালিকা'-র মূল ভাবনাটি গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই নৃত্যনাট্যের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী নগরী। এখানেও গান একটা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রকৃতির কাছে আনন্দ-র জল চাওয়া নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত—

"জল দাও আমায় জল দাও,
রৌদ্র প্রখরতর, পথ সুদীর্ঘ,
আমায় জল দাও,
আমি তাপিত পিপাসার্ত,
আমায় জল দাও,
আমি শ্রান্ত,
আমায় জল দাও।"

উত্তরে প্রকৃতি জানায়—

"ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে—
আমি চণ্ডালের কন্যা,
মোর কূপের বারি অশুচি।
তোমারে দেব জল হেন পুণ্যের আমি
নহি অধিকারিনী,
আমি চণ্ডালের কন্যা।"

কিন্তু আনন্দের উত্তরে সবকিছুর সমাধান মেলে। আনন্দ জানায়, "যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা।" সব জলই তীর্থজল, যা তৃষ্ণার্তকে তৃপ্ত করে, স্নিগ্ধ করে। আনন্দের এই ব্যবহারে মুগ্ধ হয় প্রকৃতি। নিজের জীবন সম্পর্কে ভাবনা বদলে গেল।

রবীন্দ্রনাটকে গান বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এসেছে। যেখানে গান রবীন্দ্রনাটককে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী বলেছেন—

"চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে
অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহি রে।"

চোখ দিয়ে নয়, বৈরাগী অন্তরের আলোয় দেখতে চেয়েছেন ভাগ্যকে। গানের ব্যবহার রবীন্দ্র নাটককে এক অন্য আঙ্গিক দিয়েছে। জীবননিষ্ঠ ভাবনার গভীরতায়, সমাজসচেতন বক্তব্যের ব্যঞ্জনায় তা এক অন্য মাত্রা পেয়েছে।

গ্রন্থ ঋণ:

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', ৩য়, ১৫শ, ২৩শ, ২৫শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩ থেকে ১৪০১ বঙ্গাব্দ

২। অশ্রুকুমার সিকদার, 'রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৩

৩। শঙ্খ ঘোষ, 'দামিনীর গান', দ্বিতীয় সংস্করণ, প্যাপিরাস, কলকাতা ১৪০৯